ভিসানীতি: বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হচ্ছে

লেখাটি শুরু করি ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি-জামায়াত জোট দেশময় তাণ্ডব করেছিল। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে পরের সেই তাণ্ডবে মারা গিয়েছিল ২৩১ জন নিরীহ মানুষ। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬৫জনকে। ওই সময় আহত হয়েছিল ১ হাজার ১৮০ জন। যাদের অনেকে আজও শরীরে ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি ট্রেন ও ৮টি লঞ্চে আগুন দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট।

কারণ কী ছিল সেই সহিংসতার? সরকার বলছিল নির্বাচন হবে পৃথিবীর আর ১০টা গণতান্ত্রিক দেশের মত। আর বিএনপি জোটের দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এখনও সরকারে আছে আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন নিয়ে তাদের দর্শন থেকে সরে আসেনি। তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে আসেনি বিএনপি-জামায়াত। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না ঘোষণা দিয়ে সব নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছে তারা।

ঠিক এই মুহূর্তে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জারি করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বরাত দিয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধা দেয়ায় বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারও নাম না উল্লেখ করে তিনি বললেন, যাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচারবিভাগের সদস্য এবং নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য।

যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেসব ব্যক্তি তা তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। ভবিষ্যতে আরও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করা বা এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে তারাও এই নীতির আওতায় আসবেন। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থক।

এর আগে চলতি বছরের ২৫শে মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তখন বলা হয়েছিলো যে, এই নীতির আওতায় যে কোন বাংলাদেশি যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে চিহ্নিত হন। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

এই বিধিনিষেধ ঘোষণার পর থেকে নানামুখি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে নানা মতের মানুষ। এই মুহূর্তে আমেরিকা সফররত খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভিসা নীতি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগেরও চাওয়া। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণ ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও নিষেধাজ্ঞা দেবে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণায় বিরোধীদের কথাও বলা হয়েছে। এবার বিএনপি জ্বালাও-পোড়াও করতে পারবে না। এতে জনগণের জীবন বাঁচবে।’

ভিসানীতি নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু হয়েছে মাত্র। বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। এই সরকার ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, নিজেরা নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন। এবার ২০২৪ সালে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তারা একইভাবে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন। সরকারের লক্ষ্য বিরোধীদলকে বাদ দিয়ে আবারও একটি নির্বাচন করা। বর্তমান সরকার যদি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দেয়, সেই নির্বাচন কখনও সুষ্ঠু হতে পারে না এবং সেটা কখনোই দেশের মানুষ মেনে নেবে না।”

যুক্তরাষ্টের নতুন ভিসা নীতির নিষেধাজ্ঞার তালিকায় কিছু বিরোধী দলের নেতার নাম আছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত ১৮ বছর ধরে বিরোধী দলের তো কোন ভূমিকা নেই, তারা এমন কোন কাজ করেনি, যে কাজের জন্য একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে। যেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার গণতন্ত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা বারবার বলছেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী হলে গণতন্ত্র সুষ্ঠু হয়? আজকের নিষেধাজ্ঞাদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কী? তারা

কী তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেন? এখানে আরেক দফায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় আসতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন, গত মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই ভিসা নীতি আরোপ করার সিদ্ধান্ত জাননোর পর।

আরেকটু সরল করে যদি জিজ্ঞেস করি কেন ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন কেন অংশগ্রহণমূলক হলো না? এর দায় কী শুধু সরকারের? নির্বাচন করা তো সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেছে। ২০০৮ সালে জনগণ আওয়ামী লীগকে সংবিধান রক্ষার ম্যান্ডেট দিয়েছিল। ভাঙার দায়িত্ব তো দেয়নি। সেই সময় থেকে বিএনপি-জামায়াত গো ধরেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারতো কোন স্বীকৃত নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোথাও তো এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়নি।

নির্বাচনে বাধা দেয়ার প্রশ্ন যদি ওঠে, সেই কাজটি করেছে বিএনপি-জামায়াত। তারা নির্বাচনে আসেনি। দেশময় জ্বালাও পোড়াও করে মানুষের মধ্যে নির্বাচন ভীতি সৃষ্টি করেছে। যে ভীতি আজও কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেসব নিয়ে আজকাল কথা বার্তা কম হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসা উচিত ছিল, কেন বন্ধকী গণতন্ত্র জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত? কেন তারা সুষ্ঠু গণতেন্ত্রে ফিরতে চায় না? কেন তারা ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টে শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল? চক্রটি চেনার পরেও শেখ হাসিনা কী বার বার তাঁকে হত্যার অস্ত্র হত্যাকারীদের হাতে তুলে দেবে?

যাই হোক, আগামী নির্বাচন এবং নতুন ভিসা নীতির কাছে ফিরে আসি। বিএনপি-জামায়াতের প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা কোথাও বলেননি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বার বার বলেছেন, একটি অংশগ্রনমূলক নির্বাচনের কথা। বিএনপি নির্বাচনে আসলেই তো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়। সেটা সুষ্ঠু করার দায়তো সরকারের। সেই প্রতিশ্রুতিতো সরকার বার বার দিচ্ছে। নির্বাচনে কী হবে? সুষ্ঠু হবে কী না সেটা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তো মন্তব্য করা যাবে না। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপরতো একটি সংবিধান বা রাষ্ট্র ভর করতে পারে না। যত শক্তিধরই হোক যুক্তরাষ্ট্রতো বাংলাদেশকে সংবিধান ভাঙার পরামর্শ দিতে পারে না নৈতিকভাবে।

ভিসানীতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। এখন বিএনপির ভয় পাওয়ার কিছু দেখছি না। আসলে

ভিসানীতি দিয়ে নির্বাচনের বল বিএনপির কোটে ঠেলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন নির্বাচেনে আসা তাদের দায়িত্ব। এর পরেও যদি তারা না আসে তাহলে ব্লিংকেনের ‘গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দুর্বল’ করার অপরাধে পড়বে বিএনপি। ফখরুল সাহেবরা নিশ্চয়ই আর সেই অপরাধ করবেন না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন
মজিবর রহমান

একটি বিষয় বাংলাদেশে বেশ জোরেশোরেই আলোচনা হচ্ছে। সেটা হলো বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি। আমি ভেবেছিলাম এটা কেবল শহুরে শিক্ষিত মানুষের আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন মানুষজন এসব নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু আমার ধারণা ভূল প্রমাণ করলেন গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। কয়েকদিন আগে গ্রামের একটা চা স্টলে বসেছিলাম চা পানের জন্য। আমার সমবয়সী একজন আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন- আমেরিকার ভিসাানীতি কী পারবে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে? আমি নিজে যে জবাবটা জানি অথবা যে জবাবটা দিতাম সেটা না দিয়ে উল্টো তাকেই জিজ্ঞেস করলাম তোমার কী মনে হয়? তিনি কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন- পারবে। আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টে তার দিকে তালকালাম। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলতে লাগলেন সরকারি এবং বিরোধীদলগুলোর বড় বড় নেতাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা ভালো নির্বাচন না করে তাদের কোন উপায় নেই। আবার তাকে প্রশ্ন করলাম উপায় নেই মানে কী? জবাবে

ভালোবাসারও কোন কমতি নেই। কাজেই তাদের কাছে এর তেমন একটা গুরুত্বও নেই। কিন্তু রাজনীতিবিদ, আমলা এদের কাছে এটা মহামূল্যবান। এটা ছাড়া তাদের চলবে না। কারণ এদেশে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা হয় না, তাদের অনৈতিকভাবে উপার্জিত সম্পদ নিরাপদ নয়। কাজেই যে কোন মূল্যে তাদের এর আওতার বাইরে থাকতেই হবে।
সরকারি ও বিরোধীদলের বাঘা বাঘা নেতারা সব তাদের মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। যদিও কোন দল তাদের দলীয় অবস্থানটা এখনো পরিস্কার করেননি। তবে সরকারিদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বলছেন এই বিরোধী শিবিরকে চাপে ফেলবে। কারণ তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে, কিংবা নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে জ¦◌ালাও পোড়াওয়ের রাজনীতি করতে পারবেন না। আর করলেই সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়েছে মর্মে ভিসানীতির খড়গ তাদের ওপর পড়তে পারে। সরকারিদলের নেতারা মনে করছেন এতে তারা সুবিধা পেতে পারেন। আবার বিরোধী শিবির বলছেন এটা সরকার ও সরকারিদলকে চাপে ফেলবে। একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেয়া ছাড়া তাদের কোন পথ খোলা নেই। বিরোধীদের প্রতি কঠোর অবস্থান নেয়া মানে একটা অস্থীতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। যা সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা হলেই নতুন ভিসানীতির মারপ্যাঁচে পড়ে যেতে পারেন।
তাদের এ ধরনের বক্তব্য জনগণকে আশাবাদী করে তুলছে নিশ্চয়ই? নতুন ভিসানীতির খড়গ যেন নিজেদের ওপর না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে উভয় পক্ষই নমনীয় আচরণ করবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উভয় শিবির নিজেদের জন্য, নিজেদের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার স্বার্থে ভিন্নভাবে হলেও একটা ঐক্যমত্যে পৌঁছে অবাধ, সুষ্ঠ ও সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার জন্য হলেও জনগণের চাওয়া অনুযায়ী যদি একটা ভালো নির্বাচন হয়, যদি জনগণ তাদের নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পায় তাহলে সেটাই বা মন্দ কী?